ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1319-1325
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.351

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ: বাংলার সঙ্গে বর্হিবিশ্বের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের অগ্রদূত

ড. মোঃ নওয়াজ শরিফ, *স্বাধীন গবেষক, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
মহ. সেখ মারুফ আজম, *স্বাধীন গবেষক, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Sultan Ghiyasuddin Azam Shah (1390-1411) was one of the most notable rulers of medieval Bengal, making important contributions to building strong connections between Bengal and the outside world. During his reign from the Ilyas Shahi dynasty, Bengal gained prominence on the international stage. Notably, his forward-thinking diplomacy and support for the arts and culture helped boost Bengal's global reputation. Moreover, showing his deep passion for culture and literature. On the other hand, Sultan Ghiyasuddin Azam Shah sent an envoy to the famous Persian poet Hafiz Shirazi, asking him to complete a verse of an unfinished poem. Additionally, guided by a strong religious sense of duty, he founded madrasas and hospices in Mecca (Makkah) and Medina (Madinah), while also providing financial aid to local residents. By rejuvenating historic cultural and trade links between Bengal and China, he promoted increased trade and diplomatic relations between the two nations. In Addition, during his era, the port of Chittagong became a key hub for international trade, a crucial point for pilgrims and merchants alike. These accomplishments strengthened Bengal's relationships worldwide, giving the region a respected universal standing. In this context, this research paper will explore how the Sultan Ghiyasuddin Azam Shah effectively enhanced Bengal's international relations through his diplomatic and cultural efforts.

Keywords: Bengal, Sultanate, Ghiyasuddin Azam Shah, Cultural Harmony, Political Diplomacy, International Relations.

মধ্যযুগের ভারতবর্ষে বাংলা এক গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ ছিল। ইহার পূর্বসীমা এসলামাবাদ অথার্ৎ চট্টগ্রাম ও পশ্চিম সীমা তিলিয়াগড্ডি (রাজমহলের নিকট), পূর্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্য অনুমান চারশত ক্রোশ, বঙ্গের উত্তর প্রান্তে পর্বতরাজি বর্তমান ও দক্ষিণ প্রান্তে মান্দারেন। মান্দারেন বঙ্গ সুবার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত, উত্তর-দক্ষিণে প্রস্থ অনুমান দুইশত ক্রোশ।[1] উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্গদেশে তুর্কি অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও এখানকার শাসকগণ প্রায়ই দিল্লির প্রাধান্য অস্বীকার করার চেষ্টা করতো। যদিও দিল্লির সুলতানি আমলে বঙ্গদেশ প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ছিল বলা যায়।[2] ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় স্বাধীন সুলতানি আমলের শুরু। এই সালে সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা বাহরাম খানের মৃত্যুর পর তাঁর সিলাহদার (বর্মরক্ষক) ফখরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ্ উপাধি ধারণ করে সোনারগাঁওয়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফখরউদ্দীনের স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়েই বাংলার স্বাধীন সুলতানির সূচনা। সুলতান সিকান্দার শাহের রাজত্বের পর ১৩৯৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর

পুত্র, গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ' উপাধি গ্রহণ করে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ তাঁহার পিতা ও পিতামহের মত দক্ষ নৃপতি ছিলেন। কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব যুদ্ধবিগ্রহে নয়। তিনি ১৩৯৩ থেকে ১৪১১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার সুলতান ছিলেন।[৩]

সেই সময় বাংলার সমস্ত স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে তাঁর মতো আকর্ষণীয় চরিত্র বোধ হয় আর কারো ছিলনা। তার জীবনে কোন কোন ঘটনা এতই বিচিত্র যে যেগুলি থেকে একে রূপকথার রাজপুত্রের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করা হয়।[৪] সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ অত্যন্ত দক্ষ নৃপতি ছিলেন, ন্যায় বিচারক, সুশাসক, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বিদ্বান ও কবিদের পৃষ্ঠপোষণ, সুফি-সাধকদের প্রতি ভক্তি, ইসলামী সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে মাদ্রাসা স্থাপন এবং চীন সম্রাটের সঙ্গে দূত বিনিময়ের জন্য তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[৫] এছাড়াও আজম শাহের আমলেই বঙ্গদেশ বহির্বিশ্বে পরিচিত লাভ করে। এই পরিচিতি ছিল সম্মানজনক, বিদেশে বঙ্গদেশের মর্যাদা এবং সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছিল। তুলনামূলকভাবে, বেশ কয়েকটি আরব, চীনা ও ভারতবর্ষের ইতিহাস গ্রন্থে আজম শাহের বিবরণ স্থান পায়।[৬] নিম্নলিখিতভাবে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ সুলতানি যুগে বাংলাকে বিশ্ব দরবারে পরিচিতি ঘটান এবং তিনি বিভিন্ন দেশ ও রাজ্যের সঙ্গে দূত বিনিময় করেন।

পারস্যের কবি হাফিজের সঙ্গে সম্পর্ক:

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ নিজে একজন বিদ্বান ছিলেন এবং বিদ্যার আদর করতেন। অন্যদিকে, তিনি ফার্সি ভাষায় কবিতা লিখতেন এবং প্রথমবারের মতো তিনি ইরানের বিখ্যাত কবি হাফেজকে বাংলাদেশে আগমনের নিমন্ত্রণ জানান। সমসাময়িক গ্রন্থ, রিয়াজ-উস-সলাতিনে একটি কাহিনী আছে তাও বেশ চমকপ্রদ। কথিত আছে যে একবার সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ কঠিন রোগে আক্রান্ত হন এবং তিনি জীবনের আশা ত্যাগ করেছিলেন। তাই তিনি মৃত্যুর পর তার লাশ ধোয়ার জন্য সরও, গুল ও লালা নাম্নী নামে তিনজন হারেমের মেয়েকে নির্বাচিত করেন। পরে সুলতান আরোগ্য লাভ করেন এবং মেয়ে তিনটিকে আগের চেয়েও বেশি অনুগ্রহ দেখাতে থাকেন। কিন্তু হারেমের অন্য মেয়েরা তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে এবং লাশ ধেওয়ার কথা নিয়ে তাদের উপহাস করতে থাকে। পরবর্তীকালে, মেয়ে তিনটি একদিন সুলতানের নিকট সেই বিষয়ে অভিযোগ জানায়।[৭] তাদের অভিযোগ শ্রবণ করে ক্ষনকাল চিন্তা করেই তিনি মনে মনে ফার্সি ভাষায় একটি কবিতার প্রথম চরণ রচনা করে বলে ওঠেন; "সাকি হাদিস-ই-সার্ভ, গুল ও লালা মিরাওয়াদ"।[৮] কিন্তু সুলতান কবিতাটির দ্বিতীয় চরন আর রচনা করতে পারলেন না। এছাড়াও তাঁর সভার কোন কবিও পারলেন না। তখন সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ এই চরণটি লিখে একজন দূত মারফত ইরানের শিরাজ শহরে কবি হাফিজের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। হাফিজ সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় চরনটি রচনা করেছিলেন।[৯] তৎপর হাফিজ স্বরচিত কয়েকটি পদসহ সম্পূর্ণ কবিতাটি সুলতান গিয়াসউদ্দীনের নিকট প্রেরণ করিলেন। গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ কবিতাপ্রাপ্ত হইয়া প্রীতি লাভ পূর্বক হাফেজকে যথোপযুক্ত রূপে পুরস্কৃত করেছিলেন।

বিবৃত আছে 'হে হিন্দুস্থানের তুতি পক্ষীগন, ইহার মিষ্টতা আস্বাদন কর, পারস্য দেশ হইতে বঙ্গদেশে মিষ্টান্ন প্রেরিত হইতেছে। হাফেজ, তুমি গিয়াসউদ্দীনে আজম শাহের রাজসভায় কবিতা প্রেরণ করিতে বিরত থেকোনা। কারণ তোমার বিলাপধ্বনি তথায় পৌঁছিলে আশা পূর্ণ হইবে।

প্রথম চরণ: হে (প্রেম) সুধা-দায়িনি! গোর ও লালার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় চরণ: এই প্রসঙ্গ প্রকৃতই তিনজন গোসানির জন্য উপস্থিত হইয়াছে।[১০]

অন্যদিকে, হাফিজের গজল সম্পর্কে 'আইনি-ই-আকবরী' তে উল্লেখ আছে-

> On Sikandar's death, his son was elected to succeed him and was proclaimed under the title of Ghiyasuddin. Khawajah Hafiz of Shiraz sent him an ode in which occurs the following verse: And now shall India's parroquets on sugar revel all, in this sweet Persian lyric that is borne to far Bengal.[১১]

রিয়াজ-উস-সলাতিন ও আইন-ই-আকবরীতে এই গজলটির কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, যেগুলিতে সম্পূর্ণ গজলটি (হাফিজের মৃত্যুর অল্প পরে তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু মুহাম্মদ গুল-অন্দম কর্তৃক সংকলিত) 'দিওয়ান-ই-হাফিজে' উল্লেখ পাওয়া যায়।[১২] যদিও তিনি গজলে সুলতানের নাম, তিন দাসীর নাম, বঙ্গদেশের নাম উল্লেখ করেছেন এবং এক বছরে যাত্রাপথ অতিক্রম করে বঙ্গদেশের যেতে না পারার জন্য (সম্ভবত বয়সের কারণে) গভীরভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।[১৩]

আরব দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন:

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ মক্কা ও মদিনা শরীফে বহু টাকা ব্যয়ে মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং এই দুই শহরে অধিবাসীদের মধ্যে বন্টন করার জন্য বহু অর্থ প্রেরণ করেন। যদিও সমসাময়িক কয়েকজন আরব দেশীয় এবং পাক-ভারতের ঐতিহাসিকদের লেখা বইয়ে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এই ইতিহাস গ্রন্থ গুলি হচ্ছে ইবন-ই-হজর -এর ইনবা-উল-গুমর, তকী-আল ফার্সির ইকদুথ-থামিন, কুতুব-উদ-দীন হানফীর তারীখ-ই-মক্কা এবং আল সখাভীর আল-জউ-উল-লামি।[১৪] উল্লেখ্য যে, খান জাহান নামে আজম শাহের একজন উজিরের অনুপ্রেরণায় মক্কা ও মদীনায় মাদ্রাসা স্থাপন ও সেখানকার অধিবাসীদের জন্য বহু উপহার পাঠান। এছাড়াও সুলতান নিজস্ব ভৃত্য হাবসী ইয়াকুতকে দিয়ে অর্থ ও উপহার সামগ্রী পাঠান।[১৫]

এই সময়ে মক্কায় আজম শাহের মাদ্রাসা বাব-ই-উম্মেহানি নির্মিত হয় এবং মদীনায় মাদ্রাসাটি হোসন-উল-আতিক নির্মিত হয়। উভয় মাদ্রাসাই বাঙ্গালি মাদ্রাসা বা গিয়াসীয়া মাদ্রাসা নামে পরিচিত হয়।[১৬] এ ছাড়াও মক্কায়-মাদ্রাসার নিকটে দুখণ্ড জমি এবং চারটি জলধারা কিনে মাদ্রাসাকে দান করা হয়। যদিও এই সম্পত্তির আয় থেকে মাদ্রাসার শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারী ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য ব্যয় করা হয়। মাদ্রাসা ভবনের সামনে অবস্থিত একটি বাড়িও পাঁচশত স্বর্ণ মুদ্রায় কিনে মাদ্রাসার জন্য ওয়াকফ করা হয়।[১৭] এত বেশি অর্থ পাঠানো হয়েছিল যে, মক্কা ও মদিনা শহরের প্রত্যেক লোকই তার কিছু অংশ পায়। এছাড়াও সুলতান আরাফাতে খাল খননের জন্যও ইয়াকুত মারফত অর্থ পাঠান। মাওলানা হাসান (মক্কার শরীফ) এই অর্থ গ্রহণ করেন এবং বলেন যে, আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করব। এই অর্থের পরিমাণ ছিল ত্রিশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা।[১৮]

চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন:

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের আর এক গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব, ভারতের সঙ্গে চীনের প্রাচীন সাংস্কৃতিক যোগাযোগকে তিনি পুনর্জীবিত করেন। চীনের সম্রাটও বঙ্গদেশে সুলতান ও তার বেগমের জন্য উপঢৌকনসহ দূত পাঠান। এমনকি, চীন সম্রাট বঙ্গদেশের সুলতানকে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী চীনে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেন। সেই অনুরোধ রক্ষার জন্য মহারত্ন ধর্মরাজ নামে এক বৌদ্ধ ভিক্ষু ১৪১০-১৪১১ খ্রিস্টাব্দে চীনদেশ পরিভ্রমণ করেন।[১৯] চীন দেশের বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থ থেকে সুলতান গিয়াস উদ্দিনের এই দূত প্রেরণের কথা জানা যায় যেমন- সি-য়ং-চাও-কুং-তিয়েন-লু, শু-যু-চৌ-ৎ, সেউ-লু এবং মিং রাজবংশের সরকারি ইতিহাসগ্রন্থ মিং-শে ইত্যাদি গ্রন্থে। শু-যু-চৌ-ৎ সেউ-লু নামক বইটিতে লেখা আছে য়াং-লো'র রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে (১৪০৫) বাংলার রাজা নগই-য়া-সসে-তিৎ চীনের রাজসভায় দূত পাঠান। য়ংলো'র রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে (১৪০৮ খ্রিস্টাব্দে) ঐ

দেশের (বাংলার) রাজা আবার দূত পাঠালেন। এই দূত ভেটসমেত তাই-ৎ-সাং বন্দরে এসে পৌঁছালেন। (চীনের) সম্রাট তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য পররাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রীকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন।[২০]

অন্যদিকে ১৪০৮ ও ১৪০৯ খ্রিস্টাব্দে চীনে প্রেরিত বাংলার রাজকীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ২৩০, যেখানে সৈয়দ মোহাম্মদ নেতৃত্ব দেন। সদস্য-সংখ্যা থেকে প্রতীত হয় যে, এতে কূটনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া বাণিজ্য স্বার্থও জড়িত ছিল।[২১] চীনা দূতদলের দোভাষী মা-হুয়ান এর য়িং-যাই-শেং-লান (য়ি-য়া-শ্যং-লান) গ্রন্থ থেকে চীন-বাংলার দূত বিনিময় জানা যায়।[২২] মা-হুয়ান সমুদ্রপথে সুমাত্রা দ্বীপ হয়ে নিকোবর থেকে কুড়ি দিনের যাত্রার পর ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামে অবতরণ করেন। চট্টগ্রাম থেকে একটি ছোট জাহাজে করে নদীপথে সুনউঢ়কং (সোনারগাঁও) শহরে উপস্থিত হন। তাঁর মতে, সমুদ্রের মুখ থেকে সোনারগাঁও এর দূরত্ব কম বেশি ৫০ 'লি' (১৫০ মাইল) সোনারগাঁও থেকে মাহুয়েন উত্তর-পশ্চিম মুখে ২৫ টি আস্তানা অতিক্রম করে 'পাংকোলা'র (বাংলার) রাজধানীতে পৌঁছন। তিনি রাজধানীর নাম উল্লেখ করেননি। যদিও তখন বাংলার রাজধানী ছিল গৌড়।[২৩]

উল্লেখ্য যে, সুলতানি যুগে বাঙালিদের মধ্যে সততা ছিল এবং তারা ব্যবসায়ে অনেক টাকা খাটাত। নিজেদের ক্ষতি হলেও তারা মিথ্যা বলত না বা কাউকে ঠকাবার চেষ্টা করত না। পুনরায় চীনা বিবরণে বাংলার কৃষকদেরও বেশ প্রশংসা করা হয়, তারা সারা বৎসর চাষ করত, বীজ বপন করত, ক্ষেত নিড়াত, সেচের কাজ করত এবং কঠোর পরিশ্রম করে ফসল ফলাতো তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য।[২৪] এছাড়াও বঙ্গদেশে সুতি বস্ত্রের বিশেষ উল্লেখ রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ যে, বাংলার মসলিন শিল্প অবশ্যই বিদেশীদের আকর্ষণ করত, কারণ অন্য কোন দেশে এত সুক্ষ বস্ত্র পাওয়া যেত না।[২৫] তবে এখানে চা উৎপন্ন হত না, তাই এখানকার লোকেরা চা দ্বারা অতিথি আপ্যায়ন করিত না, চায়ের পরিবর্তে তাহারা পান দিয়া অতিথি আপ্যায়ন করিত।[২৬] অতএব চীনা বিবরণে তৎকালীন বাংলার একটি সুন্দর ও প্রাচুর্যে ভরা দেশের চিত্র পাওয়া যায়।

বহির্বিশ্বের সঙ্গে পরিচয়ে চট্টগ্রাম বন্দর:

সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের শাসনামলে চট্টগ্রাম বন্দর ধীরে ধীরে একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিবরণে এই সময়ের চট্টগ্রামের সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক অবস্থার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশেষ করে আরব ভৌগোলিকদের লেখনী থেকে জানা যায় যে, চট্টগ্রামের অন্তর্গত সন্দীপ তখন এক অত্যন্ত কর্মচঞ্চল ও সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক বন্দর হিসেবে পরিচিত ছিল। এই সময়ে আরব বণিকদের অসংখ্য জাহাজ নিয়মিতভাবে চট্টগ্রাম বন্দরে আগমন করত এবং তারা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে বাণিজ্য পরিচালনা করত। যদিও বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ হিসেবে মসলাজাত দ্রব্য, বস্ত্র, মুক্তা ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রীর আদান-প্রদান হতো। ধীরে ধীরে এই বাণিজ্যিক যোগাযোগের ফলে আরব বণিকদের একটি স্থায়ী বসতি চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল, যা স্থানীয় সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল। ফলস্বরূপ, সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের আমলে চট্টগ্রাম শুধু আঞ্চলিক নয়, বরং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নেটওয়ার্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[২৭]

একই সাথে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ (১৩৯০-১৪১০) কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ইনি স্থাপন করেছিলেন চীনের সঙ্গে। তাঁর আমলে শ্রীবৃদ্ধিসাধন ঘটেছিল চট্টগ্রাম বন্দরের। সুদূর প্রাচ্যের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে সাফল্য এসেছিল প্রভূত পরিমানে।[২৮] সুমাত্রা হইতে যাত্রা শুরু করে করিয়া চৈনিক প্রতিনিধি দল সমুদ্রপথে একবিংশতি দিবস পরে বাংলাদেশের চেহ-টি-গান (চাটগাঁ) বন্দরে পৌঁছায়।[২৯] মুজাফর শামস্ বলখী যখন শেষবার হজ্জ করতে মক্কায় যান, তখন চট্টগ্রাম বন্দর থেকে যাত্রা করেন। চট্টগ্রামে তিনি

মাসাধিকাল ছিলেন। চট্টগ্রাম থেকে বলখী সুলতান গিয়াস উদ্দিনকে একটি চিঠি লিখে চট্টগ্রামের কারকুনদের কাছে এক ফরমান পাঠাতে অনুরোধ জানান, যাতে তারা প্রথম জাহাজেই মক্কা যাত্রী দরবেশদের স্থান করে দেয়।[৩০] এ থেকে বঙ্গদেশের তীর্থযাত্রীরা চট্টগ্রাম বন্দরের সাহায্যে আরব যেতো তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

যাইহোক বাঙালিরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অত্যন্ত তৎপর ছিল। সে সময় বঙ্গদেশে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা তৈরি হতো, যার মধ্যে রৌপ্য মুদ্রাকে 'তঙ্কা' বলা হতো এবং এটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো।[৩১] অন্যদিকে রাজধানীর বহু ধনী ব্যক্তির নিজস্ব জাহাজ ছিল, যা তাদের সমুদ্রপথে বাণিজ্য পরিচালনায় সহায়তা করত। ফলে তারা সহজেই বাইরের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বহির্বাণিজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। চীনা পর্যটক মা-হুয়ান তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন যে, এদেশে সমুদ্রগামী নৌযান নির্মাণের প্রচলন ছিল। ধারণা করা হয়, চট্টগ্রাম এই নৌকা নির্মাণ শিল্পের একটি প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল।[৩২] এছাড়াও চীনা বিবরণ থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, সোনারগাঁও ও চট্টগ্রাম বন্দরের উপর সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল, যা তাঁর শাসনক্ষমতা ও বাণিজ্যিক দক্ষতার পরিচয় বহন করে।[৩৩]

আরাকান রাজার সঙ্গে সম্পর্ক:

আরাকানের রাজা গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ-এর দরবারে সিংহাসনচ্যুত শাসক আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। আজম শাহ তাকে পুনরায় আরাকানের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি।[৩৪] পঞ্চদশ শতকে আরাকান ধীরে ধীরে একটি শক্তিশালী ও প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই সময়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ক্ষমতার লড়াই তীব্র আকার ধারণ করে। এই প্রেক্ষাপটে রাজা রাজাথুর পুত্র নারামেখলা (১৩৯৭–১৪০১) তাঁর শাসনকালের প্রথম দিকেই প্রতিদ্বন্দ্বীদের চাপে পড়ে আরাকান ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি নিরাপত্তার জন্য বাংলার রাজধানী গৌড়ে আশ্রয় নেন। গৌড়ে অবস্থানকালে তিনি বাংলার সুলতানের সহায়তা লাভের চেষ্টা করেন, যাতে পুনরায় নিজের রাজ্য পুনরুদ্ধার করা যায়।[৩৫]

উপসংহার:

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারা যায় যে, সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ মধ্যযুগে বাংলার সমস্ত সুলতানদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। যিনি তৎকালীন সময় যেভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন তা তাঁর অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় বহন করে। পাশাপাশি প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, সাহিত্যচর্চা, সুফি সাধকদের প্রতি শ্রদ্ধা, আরব দেশে মাদ্রাসা-সরাইখানা নির্মাণ, চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সহায়তা ও আরাকান রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাই ঐতিহাসিক সুখময় বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন, বাংলার সমস্ত স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে তাঁর মতো আকর্ষণীয় চরিত্র বোধ হয় আর ছিল না। সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের জীবনে কোন কোন ঘটনা এতই বিচিত্র যে সেগুলি থেকে একে রূপকথার রাজপুত্রের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করা হয়।

একই সাথে তার শাসনামলে বাংলার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি ন্যায়পরায়ণ ও উদার শাসক হিসেবে প্রজাদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। বিশেষত পারস্যের কবি হাফেজের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ তাঁর সাহিত্যরুচি ও সংস্কৃতিপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। এছাড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাংলাকে সমকালীন বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ফলে সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের শাসনকাল মধ্যযুগীয় বাংলার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়।

তথ্যসূত্র:

১. সলীম, গোলাম হুসেন। রিয়াজ-উস-সলাতিন। অনু. শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত (স.), দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭, পৃ.২৮।

২. চৌধুরী, তেসলিম। ভারতের ইতিহাস আদিমধ্য যুগ থেকে মধ্যযুগে উত্তরণ ৬০০-১৫৫৬। প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৫২২।

৩. আনিসুজ্জামান। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী)। দ্বিতীয় খন্ড,বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৩-৭।

৪. মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুখময়। বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর: স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রী:)। ভারতী বুক স্টল, কলকাতা, জুলাই ১৯৬০, পৃ. ৮২।

৫. করিম, আবদুল। বাংলার ইতিহাস সমাজ ও রাজনীতি। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০২২, পৃ. ২০৭।

৬. করিম, আবদুল। বাংলার ইতিহাস মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত (১২০০-১৮৫৮ খ্রী:)। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০২১, পৃ. ৮০।

৭. করিম, আবদুল। প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০।

৮. খান, আবিদ আলী। গৌড় ও পান্ডুয়ার স্মৃতি। চৌধুরী শামসুর রহমান (স.) সোপান পাবলিশার, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৩৫।

৯. মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুখময়। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

১০. সেলিম, গোলাম হুসেন। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

১১. Allami, Abul Fazl. *The Ain-i Akbari.* vol. 2. (T.) Colonel H.S. Jarrett, The Asiatic Society, Kolkata, 2010, p. 161.

১২. মজুমদার, রমেশচন্দ্র। বাংলাদেশের ইতিহাস। দ্বিতীয় খন্ড, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ফাল্গুন ১৩৭৩, পৃ. ৪২।

১৩. আহমদ, ওয়াকিল। বাংলার মুসলমানের শিকড় ও আত্মপরিচয় (মধ্যযুগ)। বইপত্র, ঢাকা ২০২২, পৃ. ৮৯।

১৪. করিম, আবদুল। প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২।

১৫. তদেব, পৃ. ২১৩।

১৬. করিম, আবদুল। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

১৭. করিম, আবদুল। প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩।

১৮. তদেব, পৃ. ২১৪।

১৯. চৌধুরী, তেসলিম। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৩।

২০. মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুখময়। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।

২১. আহমদ, ওয়াকিল। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।

২২. মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুখময়। প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬।

২৩. আহমদ, ওয়াকিল । বাংলার বিদেশী পর্যটক। গতিধারা, ঢাকা, মে ২০১৪, পৃ. ৩০ ।

২৪. করিম, আবদুল। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

২৫. তদেব, পৃ. ৭৬।

২৬. রহিম, এম আবদুর, চৌধুরী, আবদুল মোমিন, মাহমুদ এ বি মহিউদ্দিন, এবং ইসলাম, সিরাজুল। বাংলাদেশের ইতিহাস। নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৭১, পৃ. ১৯০।
২৭. রহমান, মাহবুবুর। বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক ইতিহাস। মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, সেপ্টেম্বর ২০১৩, ঢাকা, পৃ. ৫০।
২৮. রিজভী, এস. এ এ। অতীতের উজ্জ্বল ভারত। (অনু.) অংশুপতি দাশগুপ্ত, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা ২০১৫, পৃ. ১৩৪।
২৯. রহিম, এম. আবদুর চৌধুরী, আবদুল মোমিন, মাহমুদ এ বি মহিউদ্দিন, এবং ইসলাম, সিরাজুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯।
৩০. মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুখময়। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।
৩১. করিম, আবদুল। প্রাগুক্ত,পৃ. ৭৬।
৩২. আহমদ, ওয়াকিল। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।
৩৩. করিম, আবদুল। প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০।
৩৪. চৌধুরী, তেসলিম। প্রাগুক্ত,পৃ. ৫৩৩।
৩৫. https/www.britinnica.com/biography/Narameikhla, 10.03.2023.